# দুর্ভিক্ষের দেশ চীন হতে দুর্ভিক্ষ চিরতরে দূর হওয়ার পথে

## ভারতবর্ষে প্রতিটি প্রদেশে দারুণ খাদ্য সংকট, বিহারে ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ

## ★ এক বছরের মধ্যে নয়া চীন খাদ্যবিষয়ে স্বাবলম্বী ★

### ● চার বছরেও ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী ●

যে কোন সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব হল তার দেশবাসীদের খাওয়ানর ব্যবস্থা করা। যে সরকার তা করে না বা তা করবার জন্য কোন চেষ্টা করে না তাকে জনস্বার্থরক্ষাকারী সরকার বলা যায় না। তাই জনতার শত্রু সেই অপদার্থ সরকারকে ভেঙ্গে জনসরকার প্রতিষ্ঠা করার নৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব জনসাধারণের আছে। জনসাধারণের সে অধিকারকে কেবলমাত্র ফ্যাসিষ্টরাই অস্বীকার করে এবং জনতার সেই দায়িত্ব পালনে যারা অপারগ তারা সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক বাস্তবভাবে ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করছে। এই কথা বুঝে ভারত সরকারের খাদ্যনীতি বিশ্লেষণ করতে এবং তার প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ভারতবর্ষের ফিস্‌ক্যাল কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংস্কার নয়াচীনের ধারা অনুসরণ করে চলেছে। কংগ্রেসী রাজত্বের অর্থনৈতিক নীতি চীনের ধারা অনুসরণ করে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই তবে সে চীন নয়াচীন নয়, এ কথা সত্যি; তা হল চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনটাং চীন। চিয়াংএর সময়ের চীনে প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গরীব চৈনিক জনসাধারণ ঘরবাড়ী ছেড়ে দূর অঞ্চলে পালিয়ে যেত এক মুঠো ভাতের জন্য। ভাত তাদের জুটত না, জুটত কুয়োমিনটাঙী সৈন্যদের গুলিবর্ষণ। শুকনো গাছের গুঁড়ি চিবিয়ে তাদের দিন কাটত, নিজের স্ত্রী ও বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের জমিদারদের লালসার কাছে বিক্রী করে দিয়ে আসতে হত ক্রীত দাসী হিসাবে। হাজারে হাজারে শিশু তখনকার চীনা সহরের পথঘাটে কুকুর বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াত; মা বাপ যেখানে খেতে পায়না সেখানে আবার মাতৃ স্নেহ, পিতৃ কর্ত্তব্য! ওসব সুকুমার বৃত্তি খালি পেটে দুচার দিন থাকে; তার পর মানুষ পশুত্বের পর্য্যায়ে নেমে যায়, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ থাকে না। কুয়োমিনটাং চীনে এই ছিল নিত্যকার ঘটনা, প্রতিবছরই এ অবস্থা হত।


SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

# গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র ( পাক্ষিক )

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | শুক্রবার, ১লা ডিসেম্বর ১৯৫০, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা


আর আজ? মোটে এক বছর হল চীনে জনরাষ্ট্র কায়েম হয়েছে; এই অল্প সময়ের মধ্যে নয়াচীনের সরকার চীনের জটিল ও বিরাট খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। যেখানে প্রত্যেক বছর দুর্ভিক্ষই ছিল চীনের ইতিহাস, সেখানে যে শুধু গত বছর দুর্ভিক্ষ হয়ই নি তা নয়; উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মজুত ৪৫ লাখ টন খাদ্য শস্য রয়েছে তাতে করে মোট জনসাধারণকে চার মাস ধরে খাওয়ান চলতে পারে। গত বছর কৃষি মন্ত্রীর দপ্তর এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং তাতে এক পরিকল্পনা গৃহীত হয় যার লক্ষ্য হল বছরের মধ্যে ফলনকে শতকরা ৪২ ভাগ বাড়ান। এই পরিকল্পনাকে সফল করার কাজে এগিয়ে এসেছে কোটী কোটী গরীব চাষী ও লাখ লাখ চীনা সৈনিক। যে চাষীরা চিয়াংএর আমলে জমিদারদের অধীনে ক্রীতদাসের চেয়ে অধম জীবন যাপন করতে বাধ্য হত, যারা নিজের জমি বলতে কি বোঝায় তার কণামাত্র স্বাদ কখনও পায়নি সেই চাষীরা আজ জমির মালিক। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে ইতিমধ্যেই ১৫ কোটী চাষীর মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়া হয়েছে; তাদের ঋণ মকুব করে ও খাজনা কমিয়ে দিয়ে নয়াচীন গরীব জনতার রাষ্ট্র বলে নিজেকে প্রমানিত করেছে। শুধু যে আজ চীনের চাষীরাই দেশের খাদ্য সমস্যার জন্য এগিয়ে এসেছে তাই নয়, মুক্তি ফৌজ আজ চাষের কাজে লেগে গিয়েছে। কোয়ানটাং, সিনকিয়াং প্রভৃতি প্রদেশে হাজারে হাজারে চীনা সৈনিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে ব্যস্ত। আগামী বছরের মধ্যেই ৫০ লাখ টন খাদ্য শস্য বাড়তি উৎপন্ন করার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী করা ও চাষীদের সেগুলি ব্যবহার করতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কীট পতঙ্গের হাত হতে খাদ্যশস্যকে রক্ষা করার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। কিয়াংসি প্রদেশে ৭০ হাজার কৃষক ও ২লাখ ২০ হাজার সৈনিক খাল কাটার কাজে ব্যাপৃত। তাদের লক্ষ্য হল ৬ কোটী ৮২ লাখ ৫০ হাজার ঘন মিটার মাটী উত্তোলন। জল-সেচের এই বিরাট ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের চেষ্টা চলেছে। ভাল ভাল জমিগুলিতে সার দিয়ে ফসল বাড়াবার দ্রুত চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রী বিভাগ ৪২টি নতুন কেন্দ্র খুলেছে নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যেই ২০ হাজার নতুন মেসিন এবং ৪০ হাজার পুরান যন্ত্রকে সারিয়ে নতুন করে নেওয়া হয়েছে। উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব চীনে ট্রাকটারের সাহায্যে চাষবাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং চাষীদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষবাস শিক্ষা দেবার জন্য নতুন স্কুলও খোলা হয়েছে। সারা দেশব্যাপী কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার কাজে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। খাদ্য সমস্যা সমাধানের এই সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনাকে বাস্তবভাবে কাজে লাগানর ফলে প্রথম বছরেই লক্ষ্যের চেয়ে শতকরা ৪৪ ভাগ ফসল বেশী হবে বলে জানা গিয়েছে। এই ভাবে এক বছরের মধ্যেই নয়াচীন জমিদারী প্রথা বিলোপ করে চাষীর হাতে জমি বিলি করে, অতীতের যে সমস্ত ঋণ তাদের ডুবিয়ে রেখেছিল সেগুলিকে মকুব করে ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস আরম্ভ করে দিয়েছে। এই এক বছরের মধ্যেই দুর্ভিক্ষের দেশ চীন প্রাচুর্য্যের দেশে পরিণত হবার পথে পা বাড়িয়েছে। যে শক্তির দ্বারা এই বিরাট পরিবর্ত্তন সম্ভব হল তা হল রুদ্ধ জনশক্তি; জনরাষ্ট্র জনতার স্বার্থ রক্ষার কাজে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনশক্তি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কারণ সে জানে এ রাষ্ট্র তাদের, শোষণ থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছে এই রাষ্ট্র, তাদের মানুষ হবার পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছে এই রাষ্ট্র, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে এই রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করেছে এবং করবে।

আর ভারতবর্ষে? ভারতবর্ষে এখন চলেছে কুয়োমিনটাং চীনের অবস্থা। না খেতে পেয়ে ভুখা মানুষ আত্মহত্যা করছে, বাবা ছেলে মেয়েদের কুপের জলে নিক্ষেপ করছে, মা মেয়েকে বিক্রী করে দিয়ে নিস্কৃতি খুঁজছে, স্বামী দুঃখের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে; আত্মহত্যা করছে, স্ত্রী ক্ষুধার্ত্ত ছেলে মেয়ের

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় )

# ইতিহাসের ইঙ্গিত—সবল গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন

দীর্ঘ ষাট বছর আন্দোলন করার ফলে যে জিনিষটা ১৫ই আগষ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের মারফৎ এসেছে সেটা আর যাই হোক, জনগণের স্বাধীনতা যে নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। কারণ জনতা যদি সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা পেত, তা হলে তাদের জীবনে এত অন্ধকার থাকত না। সাধারণ ভারতবাসীর জীবনে আজ চারিদিকে অন্ধকার—হতাশা আর নিরাশা, দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার। শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের পেটে দুবেলা দু মুঠো ভাত জোটে না, পরণে কাপড় নেই, মনে শান্তি নেই—শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি এর কথা না তোলাই ভাল; ও সব তো এখন বড়লোকদের বিশেষ এক্তিয়ারের জিনিষ, জনসাধারণের তা বিলাসীতার সামগ্রী। পরাধীন অবস্থায় চাষীর যে দুঃখ ছিল কংগ্রেস মার্কা স্বাধীন ভারতে তা এক তিলও কমে নি, বরং বহু ক্ষেত্রে শোষণ ও জুলুম বেড়েছে। মধ্যবিত্তের বুকের ওপর বেকারীর জগদ্দল পাথর আজও চেপে বসে আছে এবং দিনের পর দিন তার চাপ বেড়েই চলেছে। কংগ্রেসী সরকার ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে শক্ত করার অজুহাত দেখিয়ে নির্বিচারে ছাঁটাই করে চলেছে। জনতাকে উপোস করিয়ে রেখে, তাকে নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যে ব্যবস্থা তার বনিয়াদকে সবল করতে চায়, সে ব্যবস্থা যে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করার জন্যে সৃষ্ট নয় সে কথা বক্তৃতা করে বোঝাবার দরকার পড়ে না। যে ব্যবস্থা জনগণের বুকের রক্ত শুষে বড়লোকের পকেট ভরাতে চায়, সেই ব্যবস্থাই ভারতবর্ষে আজ চলেছে। তাই তো শ্রমিকের রক্ত নিঙড়ে বের করে নিচ্ছে ধনিক মালিকের দল, যে দুঃখ দৈন্য দুর্দশা অত্যাচার ও শোষণ বৃটীশ শাসনের আমলে জন জীবনকে পিষ্ট করছিল আজ তার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি, পরিবর্ত্তন যা হয়েছে তা মাত্রায় তাও কমতির দিকে নয় বাড়তির দিকে।

জনগণ যেখানে সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে সেখানে শ্রমজীবি মানুষের সুখ-শান্তি বেড়েই চলে। জনতা প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে। তাই তো আজ সেখানে দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র নেই—মানুষকে উপোস করে থাকতে হয়, উলঙ্গ হয়ে চলতে হয় এ অবস্থা তারা ভাবতেই পারে না—শিক্ষা ও দীক্ষা, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দোর আজ তাদের কাছে একেবারে মুক্ত হয়ে গিয়েছে; অথচ এরাই, শ্রমজীবি মানুষের দল, তেত্রিশ বছর আগে ঠিক আমাদেরই মত শোষণে আর অত্যাচারে জর্জ্জরিত ছিল। বিপ্লবের মারফৎ তারা ধনিক শ্রেণীর শোষণ যন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চুরমার করে ভেঙে ফেলে তার বদলে নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তুলেছে বলেই না তাদের আজ এই অগ্রগতি। শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নই নয়; মধ্য ইউরোপের নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলিও লম্বা লম্বা পা ফেলে এই পথে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সময় এদের জন্ম, অথচ এই ক বছরের মধ্যেই তারা বেকার সমস্যার সমাধান করেছে, মেহনতী মানুষের খেয়ে পরে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠার পথে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। অত দূরে যাবার দরকার কি? আমাদের প্রতিবেশী মহাচীনের ইতিহাসই তো এ কথার সমর্থন করে। কুয়োমিনটাঙী দুঃশাসনে বিধ্বস্ত চীন এই সেদিন—মোটে এক বছর হোল—পচা শোষণব্যবস্থা ভেঙে ফেলে এক নতুন শোষণহীন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। এই এক বছরেই সেখানকার উন্নতি আশাতীত। চীন আজ আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের দেশ নয়, আজ সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে উন্নতির ধাপে ধাপে। চৈনিক চাষী আজ আর জমিদারের ক্রীতদাস নয়, আজ সে নিজেই জমির মালিক পূর্ণস্বাধীন; মজুর শোষণের শেকলে বাঁধাপড়া অজ্ঞ মানুষ পশু নয়, আজ সে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমান অংশীদার। সংহাই এর শ্রেষ্ঠ অভিজাত হোটেল আজ পরিণত হয়েছে শ্রমিকদের ক্লাবে, লেখাপড়া, খেলা ধুলা গানবাজনার সমস্ত রকম ব্যবস্থাই সেখানে করা হয়েছে হাজার হাজার বছরের জমাট অন্ধকারকে দূর করে মানুষকে মানুষ হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টায়। এরই নাম তো জনগণের স্বাধীনতা; সোভিয়েটে যা হয়েছে, মধ্য ইউরোপে ও মহাচীনে

( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

## মধু ও হুল

এ কি কথা শুনি আজি সিয়াং এর মুখে! চিয়াং নাকি সমাজতন্ত্রী! রাষ্ট্রসংঘে কুয়োমিনটাং সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ সিয়াং মার্কিন মুল্লুকে সফরের সময় এক বক্তৃতায় বলেছেন—মার্শাল চিয়াং কাইশেক প্রকৃত পক্ষে সমাজতন্ত্রী; ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী সে ব্যাপার বুঝতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধতা করে ভুল করেছেন। ডাক্তার সাহেবের কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি! মার্কিণে গিয়ে সমাজতন্ত্রী বলার মানে ফাঁসিতে গলা বাড়িয়ে দেওয়া—এ কথা কি ডাক্তার সাহেব ভুলে গেলেন? ফরমোসায় বসে ভদ্রলোক শুধু মার্কিণ কর্ত্তাদের পদসেবা করে সাহায্য কিছু পাচ্ছেন, ডাঃ সিয়াং কি সে টুকু সাহায্য বন্ধ করিয়ে দিয়ে চিয়াংকে চীন সাগরে তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে মারতে চান? এর চেয়ে যদি তিনি চিয়াংকে গণতন্ত্রি বলতেন আর সঙ্গে সঙ্গে মাও সে তুংকে ফ্যাসিষ্ট দস্যু বলে অভিহিত করতেন তাহলে আখেরে কিছু বেশী মেলার সম্ভাবনা থাকত তা না কিনা সমাজতন্ত্রী বলতে যাওয়া? তাও আবার যে রকম সে রকম করে নয়, পণ্ডিত নেহেরুকে তিরস্কার করে। ডাক্তার সাহেব হয়ত জানেন না যে, এখন নেহেরু ট্রুম্যান গোষ্ঠির সুয়ো রাণী, দিন কতক আগে চিয়াং যা ছিলেন। সুতরাং সেই 'pet wife' এর নামে কিছু লাগিয়ে কর্ত্তার মন ভেজাবার চেষ্টা করলে উল্টো উৎপত্তিই হবে। physician heal thyself এ কথা ছাড়া ডাঃ সিয়াং কে আর কি বলা যায়?

★ ★ ★

ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের ঝগড়া মায় যুদ্ধ পর্য্যন্ত এবার বেধে যেতে পারে। খবরটা শুনতে অবাক হবার মত। রাজনীতিজ্ঞরা তো এটাকে গুল বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু কারণগুলি তলিয়ে দেখলে ঐ সিদ্ধান্তে পৌছুতেই হবে। দেখে দেখুন কথাটা সত্যি কিনা। ভারত সরকার এদেশে রেলে চড়বার জন্যে বিদেশীদের নিমন্ত্রণ জানাতে আরম্ভ করেছেন এবং কলকাতায় খুব ঘটা করে বিদেশী ভ্রমনকারীদের জন্য একটা অফিসও খুলেছেন, এই সব বিদেশী ভদ্রলোক ভ্রমনকারীদের অভ্যর্থনার জন্যে একটি তরুনীও নিযুক্ত হয়েছেন এরপর আপনারা বলুন যুদ্ধ বাধবে কি না? কি? ব্যাপার বুঝলেন না? তবে আরও শুনুন। ভারত সরকারের নিমন্ত্রনে নিশ্চয় ইঙ্গমার্কিণ কর্ত্তারা এদেশে নিমন্ত্রন রক্ষা করতে আসবেন, বিশেষ করে যখন আপ্যায়নের পাকা ব্যবস্থা আছে। তারপর ভারতবর্ষে এসে যদি তাঁরা সব খুন হন ভারতবাসীর দ্বারা, তাহলে যুদ্ধ না বেধে পারে? প্রথম মহাযুদ্ধ সার্বিয়ার মত খুঁদে একটা জায়গার রাজ পুত্রকে মারা নিয়েই না বেধে উঠল আর এ তো তার চেয়ে অনেক জাঁদরেল লোককে হত্যা করা হবে। যদি বলেন কে হত্যা করবে এবং কি করে। তাহলে শুধু সরকারি প্রেসনোট থেকে আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলব—ভারতবর্ষে চার মাসে ৬৫৩টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশই আততায়ীদের কাজ। ভাবুন সিদ্ধান্ত আমাদের ঠিক কিনা।

★ ★ ★

অ্যাং যায় ব্যাঙ যায়, চুনো পুঁটি বলে আমিও যাই এ হল মানুষের ধর্ম্ম। বড় বড় লোকেরা যা করেন ছোটরাও তাই করতে চায়। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীরা নিজেদের অমূল্য সময়ের যাতে অপব্যয় না হয় তার জন্যে মোটর আর ট্রেণে চড়া ছেড়ে দিয়ে বিমানে চড়া ধরেছেন। সরকারী তহবিল হতে বিমান কেনাও হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীরা যদি বিমান চড়তে পারেন তাহলে খুঁদে কর্ত্তারাই বা চড়বেন না কেন? পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী অতুল্য ঘোষ মশাইও দিনাজপুরের খাদ্যাভাব দর্শন করে এসেছেন আকাশ হতে। অবশ্য আমরা অতুল্য বাবুকে মন্ত্রী মশাইদের চেয়ে কোন অংশে কম বলতে চাই না। তবে আমাদের ধারণা ছিল তিনি চোখে একটু কম দেখেন, তাই হয়ত মাটীতে দাঁড়িয়েই খাদ্যাভাবটা দেখবেন। এখন দেখছি আমাদের ধারণাটা ভুল; শকুনি গৃধিনীর দল ওপর থেকেই ভাল দেখতে পায়। মাটীতেই তাদের দৃষ্টি শক্তি কমে যায়।

# আমেরিকার অর্থনীতির সমাজের প্রয়োজন মেটাবার নমুনা

## ● 'গণতন্ত্রী' মার্কিণ রাষ্ট্র ১৩ জন ধনকুবেরের নির্দ্দেশ মত চলতে বাধ্য

### ● ● একবছরের লাভের পরিমাণ ৫০০০ কোটী ডলার : ১ কোটী ৮০ লক্ষ লোক বেকার

### ● ● ● ধনিক শ্রেণীর লাভের জন্য গরীব জনতাকে উপবাসী রাখা—৯ কোটী ১০ লাখ বুশেল আলু নষ্ট

**পাকিস্তানস্থ মার্কিণ সাংস্কৃতিক অফিসার, মিঃ জর্জ ক্যানড্রেভা লাহোরে** এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমি এ কথা জোরের সঙ্গে বলব যে, আমেরিকা যে কোন জাতির সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমূলক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। সে এই দুই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দূরীকরণের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এখন পুঁজিবাদকে যারা ১৮৫০ সালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করে তারা ১০০ বছর পেছনে পড়ে আছে বলতে হবে। আমেরিকার পুঁজিবাদ জনসাধারণের উন্নতির অস্ত্র হিসাবে পরিণত হয়েছে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার কাজেই সাড়া দিয়ে চলেছে।" মিঃ ক্যানড্রেভার কথাগুলি শুনলে মনে হবে, সত্যিই বুঝি মার্কিণ মুল্লুকে পুঁজিবাদী শোষণ নেই, জনতা সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করছে। সোনার যেমন পাথর বাটী হয় না, তেমনি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজনের স্বার্থে পরিচালিত হতে পারে না। আর শোষণমূলক পুঁজিবাদ বলে নতুন কোন পুঁজিবাদ নেই, সব পুঁজিবাদই শোষণ মূলক। পুঁজিবাদের চালক শক্তিই হ'ল শোষণ। সুতরাং মার্কিণ সাংস্কৃতিক অফিসারটি যা বলেছেন, তা হ'ল নিছক ধাপ্পা, ফাঁকা কথা।

ইংরাজীতে মিথ্যা তিন রকমের আছে—প্রথম হ'ল সাধারণ মিথ্যা, দ্বিতীয় হ'ল রাম মিথ্যা, আর তৃতীয় হ'ল ষ্ট্যাটিসটিকস অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্ব। পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিপতিদের পোষা অধ্যাপক, পণ্ডিতদের সম্পাদনায় কিংবা সরকারী উপদেশ অনুসারে যে সমস্ত হিসাবপত্র প্রায় প্রকাশ হয়ে থাকে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধনিক শ্রেণীর মুনাফা কম করে দেখান, পুঁজিপতি প্রভুদের দেবতা হিসাবে আঁকা, এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যন্ত্রটিকে স্বর্গরাজ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা। এটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কারণ ধনিক প্রভুরা তো তাঁদের কালো কাজগুলিকে সাদা করে দেখাবার চেষ্টা করবেই। সব পুঁজিবাদী দেশেই এটা হয়ে থাকে, আমাদের দেশেও। বিড়লার Eastern Economist পত্রিকা সংখ্যাতত্ত্ব মাঝে মধ্যে প্রকাশ করে কিন্তু তার মূল বক্তব্য থাকে, বড় বড় ব্যবসাদারদের লাভের হার কমে যাচ্ছে ক্রমশঃ। এ হেন যে রাম মিথ্যা সেই সংখ্যাতত্ত্বই কি বলে দেখা যাক।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটি মার্কিণ মুল্লুকের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরীক্ষা করে যে অবস্থা দেখেছেন তাতে বোঝা যায় প্রকৃত গণতন্ত্রের যদি সব চেয়ে গলা টিপে মারা হয়ে থাকে কোথাও তা হ'ল আমেরিকায়। একটা শিশুও একথা জানে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা কাগজী স্বাধীনতা হতে বাধ্য। প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশে তাই সত্যকারের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় জনতার তা নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আবার সারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা শাসন করছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। এরাই হল দেশের আসল শাসক, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এদেরই আদেশ অনুসারে চলতে হয় আমেরিকার সভাপতিকে এবং তিনি চলেনও। ১৯৩৫ সালের হিসাবে আমেরিকায় ৪০০ জন লোক ২০০ টি বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট ৩৫৪৪ জন ডিরেক্টরের এক তৃতীয়াংশ পদ দখল করেছিল। ৮টি গ্রুপ মোট ২৫০ টি করপোরেশনের মধ্যে ১০৬ টির শাসক। হিসাবটা আরও সঙ্কুচিত করলে দেখা যায় মোট ১৩ টি পরিবার আমেরিকার অর্থনৈতিক ভাগ্যবিধাতা, এদের মধ্যে আবার তিনটি পরিবার— ডুপন্ট, মেলন ও রকফেলার—গোটা আমেরিকার প্রধান প্রধান ১৫ টি কর্পোরেশনের মালিক; আইনতঃ ৮০০ কোটী ডলারের ওপর খবরদারী করছে। যুদ্ধের আগের এই হিসাব যুদ্ধের মধ্যে আরও ফেঁপেছে। ছোটখাট যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল তারা কেউই এই সব রাঘব বোয়ালদের আক্রমন থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে নি। U. S. Smaller War Plants Corporation এক রিপোর্টে বলেছে—"সরকারী হিসাবেই প্রকাশ ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালে ৫ লাখ ছোটখাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বসে গিয়েছে।" এই সব ছোটখাট প্রতিষ্ঠানগুলি বড়দের পেটে গিয়েছে। এইভাবে কয়েকটি পরিবারই আমেরিকার ভাগ্যনিয়ন্তা। তবুও নাকি আমেরিকায় শোষণমূলক পুঁজিবাদ নেই।

এই সব ধনকুবেরদের লাভের মাত্রা শুনলে চোখ দাঁড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে পুঁজিপতিদের মুনাফা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। ১৯৪৫-৪৯ সালের মোট লাভের পরিমান আরও বেড়ে হল ১৩৫২০ কোটী ডলার। ১৯৫০ সালে তার বেশী হয়ে দাঁড়াল (মোটামুটি হিসাব আসল আরও বেশী হবে) ৩৫০০ কোটী ডলার। ১৯৪৯ সালের চেয়ে ১৯৫০ সালের মুনাফা শতকরা ৩০ ভাগ বেড়েছে। এই লাভ ছাড়া ১৫০০ কোটী ডলার আলাদা করে রাখা হয়েছে যন্ত্রপাতির ক্ষয় ক্ষতির জন্য। তাহলে মোট লাভের পরিমাণ হ'ল ৫০০০ কোটী ডলার একা এক ১৯৫০ সালেই।

অনেকে বলতে পারেন জিনিষপত্র বেশী করে তৈরী করা হচ্ছে এবং বিক্রী করা হচ্ছে তাই লাভ হচ্ছে বেশী। কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। ইস্পাত শিল্পে বিক্রী বেড়েছে শতকরা ৩ ভাগ অথচ লাভ বেড়েছে শতকরা ১৯ ভাগ; সব শিল্প জড়িয়ে ধরলে দেখা যায় যেখানে বিক্রী বেড়েছে শতকরা ৮ ভাগ সেখানে মুনাফা বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। এই লাভ করার উপায় হল মজুরদের বেশী করে ঠকান, তাদের কম মজুরী দিয়ে বেশী খাটান।

এক দিকে ওয়ালষ্ট্রীটের কর্ত্তাদের লাভ বাড়ছে অন্যদিকে তাদের ওপর ট্যাক্স কমছে। ১৯৩৯ সালে ২৫ হাজার ডলারের বেশী যাদের আয় তাদের ব্যক্তিগত আয়করের মোট পরিমানের শতকরা ৬৫ ভাগ দিতে হত, ১৯৪৭ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৩ ভাগ, অথচ ৫ হাজার ডলারের কম আয় যাদের, তারা যেখানে ১৯৩৯ সালে শতকরা ৭ ভাগ আয়কর দিত, ১৯৪৭ সালে সেখানে তাদের দিতে হয়েছে শতকরা ৪৮ ভাগ। আয় যার কম তাকে বেশী করে ট্যাক্স দিতে হবে আর আয় যার বেশী সে ট্যাক্স দেবে না—এই হ'ল পুঁজিবাদী দুনিয়ার নিয়ম। আমাদের দেশেও এই; টাটা বিড়লা, ডালমিয়া গোষ্ঠি আয়কর ফাঁকি মারে আর গরীব জনতার সেই কর পোষাতে হয়। সুতরাং আমেরিকায় যে কি ধরণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আছে তা এই সব হিসাব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উদারনৈতিক বুর্জোয়া, যাদের একটু আধটু চক্ষুলজ্জা আছে, তারাও এই রকম পুঁজির একেন্দ্রীকরণকে গণতন্ত্রের গলা টিপে মারা বলে মনে করে। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রুজভেল্টও তাই ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন—"যে দেশের জনসাধারণ বেসরকারী শক্তিকে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে বেশী হওয়া সহ্য করে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বাধীনতা নিরাপদ নয়।"

এ সব হ'ল একদিক। বড়লোকদের এই সব কোটী কোটী ডলার মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বেড়েই চলেছে। মার্কিণ মুল্লুকে ৬০ লাখ লোক পূর্ণবেকার এবং ১ কোটী ২০ লাখ লোক অর্দ্ধ বেকার। এই সব অর্দ্ধ বেকারদের কাজের হিসাব নিলে আবার দেখা যায়, তাদের মধ্যে অনেকের সপ্তাহে চার ঘণ্টাও কাজ নেই। আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সামাজিক মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হ'ত তাহলে সে দেশে এত বিরাট বেকারের দল থাকতে পারত না। যে দেশের অর্থনীতির লক্ষ্য জনসাধারণের সুখ সাচ্ছন্দ সে দেশে এ রকম হতেই পারে না। উৎপাদন সেখানে ভোগের জন্য, লাভের জন্য নয়। আমেরিকা পুঁজিবাদী দেশ, উৎপাদনের লক্ষ্য হ'ল সেখানে লাভ।

( ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন )

# নেহেরু সরকারের নিরপেক্ষতার নমুনা

## ইঙ্গমার্কিণ সাংবাদিকদের পুরা স্বাধীনতা

### টাস এজেন্সির উপর কড়া পাহারা ও প্রত্যেক চিঠিপত্র তল্লাস

ভারতীয় সরকারের মেকি নিরপেক্ষতার আবরণ বহুদিন খুলে গিয়েছে; সমস্ত পৃথিবীর লোকই আজ

( ৩য়পৃষ্ঠার পর )

তাই লোক বেকার হল কি মরল ও রাষ্ট্র-চালক ও পুঁজিপতিদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। তাদের সম্পর্ক ও লক্ষ্য লাভের সঙ্গে ওদিকে। দেশের মধ্যে বিরাট এক বেকার বাহিনী থাকলে লাভের মাত্রা বরং বাড়ে, কারণ এই সব অভুক্ত জনতাকে দিয়ে অতি অল্প মজুরীতে, এক রকম বিনা খরচে, খাটিয়ে নেওয়া যায়। তাই আমেরিকায় ২ কোটীর মত লোককে বেকার করে রাখা হয়েছে, তাই কম বিক্রী করেও লাভের মাত্রা বাড়ছে।

শুধু বেকার করে রাখা নয়; না খেতে দিয়ে মারার চেষ্টাও চলছে বেশী লাভ লুঠবার আশয়। আমেরিকার সাধারণ মানুষ যেখানে খাদ্যের অভাবে একর কম উপোষ করছে সেখানে উৎপাদিত ফসল পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে ঘাটতি ঘটিয়ে খাদ্য শস্যকে চড়া দামে বিক্রী করা যায়। মার্কিণ সরকার সম্প্রতি আলু-চাষীদের এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেছেন যে, আগামী বছরে আলুর চাষ শতকরা ২১ ভাগ—৯ কোটী ১০ লাখ বুশেল—কমাতে হবে। এই আদেশ জারীর অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম করিয়ে চড়া দামে বিক্রী করে লাভ লোঠা। মার্কিণ গণতন্ত্রের এই হল আসল চেহারা।

কিন্তু এই আসল চেহারা প্রকাশ হলে জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া সহজ হবে না, তাই মিঃ ক্যানাডেভা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমেরিকার পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রশংসা করে চলেছেন। ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মাতব্বররা মার্কিণ প্রেমে গদগদ। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা নাকি সব মার্কিণ দেশে আছে। মার্কিণের সবকিছুই নাকি অসাধারণ রকমে ভাল। তাইতো মার্কিণ শিক্ষা মিশন আসছে ভারতবাসীর শিক্ষা সম্বন্ধে ভারত সরকার-কে উপদেশ দিতে। আমেরিকার ধারায় জীবন নেতাদের আদর্শ, যে আদর্শ প্রচার করে চলেছে সিনেমার অস্বাভাবিক, যৌন কিংবা অপরাধ বিষয়ক ছবি, সাময়িক পত্রিকার নামে জঘণ্য প্রচার। সেই পচা পুঁজির দাঁ ইয়াংকি সংস্কৃতির অফিসার যখন মিঃ জর্জ তখন তিনি যে এই ধরণের মিথ্যা কথা বলবেন তাতে আর অবাক হবার কি আছে? তবে জনসাধারণ এখন আগেকার মত সরল নেই, তারা সব জিনিষ যাচিয়ে নিয়ে বিশ্বাস করতে চায়। তাই এই ধরণের মিথ্যার বেসাতি বড় একটা কাজে আসবে না একথাও ঠিক।

জানে নেহেরু সরকার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধবাদীদের তল্পিদার। তবুও নতুন আর একটা প্রমান পাওয়া গেল, দিল্লীর কর্ত্তাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের। ভারতবর্ষে ইঙ্গ-মার্কিন সাংবাদিকদের ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ওপর কোন রকমে হস্তক্ষেপ করা হয় না। তাঁরা নির্বিচারে সর্ব্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারছেন। এমন কি সংবাদিকের ছলে যে সমস্ত গুপ্তচরের দল কাশ্মীরে সামরিক ঘাঁটী গাড়ার উপযুক্ত স্থান ঠিক করতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তাঁদের কার্য্যাবলীর ওপর কোন নজর রাখা হয় নি। অথচ দিল্লীস্থ টাস নিউস এজেন্সির ওপর কড়া নজর ও সেন্সারের আদেশ জারী করা হয়েছে। ফলে উক্ত নিউস এজেন্সির ৬নং ক্যানিং রোডের অফিসের ওপর শুধু কড়া নজরই রাখা হয় নি; যে কোন চিঠি ঐ ঠিকানায় পাঠান বা ওখান থেকে পাঠান হবে তাদের প্রত্যেকগুলিকেই সেন্সার করার পর তবে বিলি করা কিংবা যেতে দেওয়া হবে। ১৮৯৩ সালের ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অফিস অ্যাক্ট অনুসারে এই আদেশ জারী করা হয়েছে।

নেহেরুর মুরুব্বি এটলি, ট্রুম্যানের দল পৃথিবীর বুকে যে জঘন্য যুদ্ধ বাধাবার অপচেষ্টা করছে, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয় প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতাকামী দেশ-বাসীর ওপর যে বর্ব্বর অত্যাচার চালাচ্ছে—সে সব নৃশংসতার সংবাদ ও দলিল টাস নিউস এজেন্সি প্রকাশ করে দিচ্ছে বলে নেহেরুচক্রের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আবার ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা জগত যাতে জানতে পারে তার খাঁটী সংবাদ টাস নিউস এজেন্সি পরিবেশন করে থাকে এই রকম সত্য সংবাদকে পুঁজিপতি শ্রেণীর ভয় সবচেয়ে বেশী, যেহেতু জনতাকে ধাপ্পা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা যে কোটী কোটী টাকা খরচ করে প্রচারের মারফৎ তা তাহলে বানচাল হয়ে যায়। এই কারণেই মুখে নিরপেক্ষতা ও সংবাদ-পত্র ও প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার কথা বলেও নেহেরুর মন্ত্রীসভা সে স্বাধীনতা দিতে নারাজ।

# মালদহে খাদ্য অভিযান কমিটি গঠিত

## ● প্রকাশ্য জনসভা হতে সভ্য নির্ব্বাচিত

## ★ আর, এস, পি, সোস্যালিষ্ট পার্টি ও আর, এস, এস, আঁতাত

মালদহ বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৭ই নভেম্বর তারিখে মালদহ টাউন হলে বিভিন্ন দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের এক সভা ডাকা হয়, খাদ্য-আন্দোলন কি করে যুক্তভাবে পরিচালিত এবং সেই উদ্দেশ্যে সংযুক্ত খাদ্য অভিযান কমিটি প্রস্তুত করা যায় সেই বিষয় আলোচনা করার জন্য। সভায় আর,এস, এস দলের প্রতিনিধিরা যোগ দেন নি; সুতরাং কোন কিছু ঠিক করা যেতে পারে না—এই কথা বলে সোস্যালিষ্ট পার্টির সম্পাদক সেই দিনের সভা স্থগিত রাখার জন্য দাবী জানান। আলোচনার পরও তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করতে রাজী না হওয়ায় বাধ্য হয়ে ১২ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশ্য জনসভা ডাকার এবং সেই সভা হতে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১২ই তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুত কালীরঞ্জন লাহিড়ী। সভার প্রারম্ভে বাস্তুহারা কমিটির সম্পাদক শ্রীশচী রায়, সংযুক্তভাবে খাদ্য আন্দোলন পরি-চালন করার আবশ্যকতা বুঝিয়ে দিয়ে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি ও প্রগতিশীল ব্যক্তি নিয়ে সংযুক্ত খাদ্য অভিযান কমিটি গঠন করার প্রস্তাব আনেন। এতে সোস্যালিষ্ট পার্টির কালীরঞ্জন রায় সংযুক্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে বলেন, মালদহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটী আছে; সেটাই সংযুক্ত কমিটি।

এর উত্তরে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সংগঠক কমরেড রবীন দেব বলেন যে, মুখে সংযুক্ত আন্দোলনের কথা আর বাস্তবে দলীয় সঙ্কীর্ণতার দ্বারা চালিত হওয়া—জনতাকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। খাদ্য সমস্যা আর শুধু খাদ্য সমস্যা কেন, জনতার প্রতিটী দাবীর ভিত্তিতে আজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে কংগ্রেসী সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতিকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়, এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার ও তাকে পরিচালিত করার জন্য একটা সংযুক্ত সংগঠন ও দরকার। দুর্ভিক্ষ

( ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন )

# বংশীধরপুরে বিরাট

## সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতির প্রতিবা

### সরকারবিরোধী ধ্বনি সহ দুই

"যে সরকারের মূল লক্ষ্য ধনিক শ্রেণীর তার খাদ্য সমস্যার সমাধান করতেই পারে সংগ্রহ ও বণ্টন নীতির ফলে একদিকে গ গহ্বরে তলিয়ে যাবে, অন্যদিকে দেশে দুর্ভি পুঁজিপতিরা মুনাফার পাহাড় লুঠে চলবে বাঁচতে হলে, ফসলের উপযুক্ত দাম পে আন্দোলন করতে হবে এবং সেই আন্দোল এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে"—গত ১২ই ন মজুর ফেডারেশন ও সোস্যালিষ্ট ইউনি জেলা কমিটির মিলিত উদ্যোগে বংশীধরপু সভাপতি হিসাবে বিহারের সাঁওতাল চাষ চক্রবর্ত্তী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সভা আরম্ভ হবার আগে প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা বি একটি গণসঙ্গীত করেন। পরে স্থানীয় কং কৃষক নেতা কৃষ্ণ লাল ব্যানার্জী উপস্থিত রে চাষী ভাইদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অ অপরিহার্য্যতা বুঝিয়ে দিয়ে বলেন— "কংগ্রেসী সরকারের তিন বছরের রাজত্বে দেশে এমন কোন আইন বা বিধান হয়নি যাতে গরীব মানুষের সুবিধা হয়েছে, বরং দিনের পর দিন তাদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ বেড়েই চলেছে। সুপারি তামাক প্রভৃতি রোজকারের দরকারী জিনিষের ওপর ট্যাক্স বাড়ছে, কাপড় চোপড়ের দাম সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে, জনতা না খেতে পেয়ে কুকুর বেড়ালের মত মরছে অথচ বড়লোকদের লাভ বাড়ছে, সরকার তাদের ওপর ট্যাক্স কমিয়ে দিয়ে তাদের আরও বেশী করে গরীবের বুকের রক্ত শুষতে সাহায্য করছে। গান্ধীভক্ত সরকার গরীব চাষীর খাবার ধান কেড়ে নিচ্ছে এক রকম বিনা দামে মণপ্রতি সাড়ে সাত টাকায়। আর তা থেকে তারা লাভ করে চলেছে মণপ্রতি চার সাড়ে চার টাকার মত। অথচ এই সরকারই পুঁজিপতিদের বেশী লাভের জন্য, বর্ষা থেকে ২৪৲ টাকা মণ দরে চাল কিনছে। এই অন্যায় অবিচারকে বন্ধ করতে হলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে চাষী ভাইদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত কিষান সভা ও ক্ষেত-মজুর ভাইদের ক্ষেতমজুর ফেডারেশনকে শক্ত করে তোলাই এখনকার একমাত্র কাজ।"

# কৃষক সমাবেশ

## দে গরীবচাষী ও মজুরদের সভা

### হাজার লোকের মিছিল

মুনাফা রক্ষা, যে সরকার জন-
না; এবং সেই সরকারের খাদ্য
রীব চাষীর দল দুরবস্থার অতল
ক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে জমিদার
। সুতরাং গরীব চাষীভাইদের
ত হলে তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে
নকে জনতার খাদ্যের জন্য লড়াই
ভেম্বর তারিখে ২৪ পরগণা ক্ষেত
টি সেন্টার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
র যে কৃষক সমাবেশ হয় তাতে
াদের নেতা কমরেড অমৃতেশ্বর

কমরেড ব্যানার্জীর বক্তৃতার পর
শিষ্ট কৃষক সংগঠক কমরেড জিয়াদ বক্স
গ্রেসী রাজত্বে চাষীদের ওপর অত্যাচা-
র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন— ভাইসব,
পনারা নিশ্চয় জানেন, কংগ্রেসী সর-
ারের লোকেরা ঢোলাহাটের গরীব
ষীদের খাবার ধান যখন কেড়ে নিচ্ছিল
খন ভুখা চাষীরা জানতে চায় বড়লোক
মিদারদের যে গোলা গোলা ধান ভর্ত্তি
য়ছে ও ধান না নিয়ে তাদের খাবার
ট নিচ্ছে কেন? আমাদের ছেলে
য়েদের মুখের গ্রাস আমরা কেড়ে নিতে
ব না, এই বলে চাষী ভাইরা সরকারের
করা নীতির প্রতিবাদে এগিয়ে এলে
দের ওপর গুলি চালান হয়। তাতে
াদের পাঁচজন ভাই মারা পড়েন।
ধরণের অত্যাচার আমাদের ওপর ও
রবে; তাকে ব্যর্থ করে হলে, আমাদের
ইদের খুন করার প্রতিশোধ নিতে হলে
মাদের সংগঠনকে ধারাল করতে
ব—সংগঠনই আমাদের হাতে সবচেয়ে
ারদার অস্ত্র।"

তারপর দক্ষিন ২৪ পরগণার বিখ্যাত
ক নেতা ও বাংলা প্রাদেশিক সংযুক্ত
ষাণ সভার মহঃ সম্পাদক কমরেড
ীর বন্দোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলা
গ্রেসী সরকারের চাষীদের ওপর
ন জুলুমের চক্রান্ত সম্বন্ধে সাবধান
রে দেন সম্প্রতি চাষীদের ওপর এই মর্মে
ক আদেশ জারী হয়েছে যে সরকারের
মতি ছাড়া কেউ জমি থেকে ধান
তে পারবেনা। এ আদেশের একমাত্র
উদ্দেশ্য হল, সারা বছরের পরিশ্রমের ফল
সরকার বিনা পয়সায় লুটে নিতে চায়।
এইভাবে চাষীর ধান জমিতে আটকে রেখে
পুলিশের সহায়তায় তা সুবিধে মত
তোলা হবে জমিদারের গোলায়। এ চেষ্টা
গত বার ও কোথাও কোথাও করা
হয়েছিল আদেশ জারী না করেই লাঠি
আর গুলির দাপটে। চাষীরা এই
জুলুমের প্রতিবাদ করেছিল বলে সরকার
এবার আইন করে চাষীদের না খেতে
দিয়ে মারতে চায়। কমরেড বন্দো পাধ্যায়
সমবেত চাষীদের বলেন— 'এইখানে এই
সভায় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে—জান থাকতে
ধান লুঠতে দেব না, ঐক্যবদ্ধতা আর
প্রতিরোধের আঘাতে জমিদার মিল-
মালিকদের প্রতিভূ কংগ্রেসী সরকারের
ষড়যন্ত্র ভাঙবোই ভাঙবো"। বিপুল
উত্তেজনা ও জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁর বক্তৃতা
শেষ হয়।

এর পর ২৪ পরগণা ক্ষেতমজুর
ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুবোধ
ব্যানার্জী গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরদের
আহ্বান করে বলেন—"ভাইসব, আমা-
দের দাবী আমাদেরই আদায় করে নিতে
হবে, আমরা যদি চুপ করে বসে থাকি
আর ভাবি, অমুক দল আমাদের হয়ে
লড়ে আমাদের দাবী আমাদের কাছে
এনে দেবে তাহলে সে আশা কোন দিনই
সফল হবে না। প্রথমে আমাদেরই ঐক্য-
বদ্ধ হতে হবে, আমাদের নিজস্ব
সংগঠনকে পাথরের মত শক্ত করে গড়ে

( ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন )

# ★ ভারত সরকারের উদ্বাস্তুদের সাহায্যের বহর ★

## মাসিক ১৲ টাকা ভরণপোষণ ব্যয় মঞ্জুর

### ● তাও আনার জন্য ৬ মাইল হাঁটতে ও তিনখানা ফটো দাখিল করতে হবে ●

ভারত সরকারের দৃষ্টি যে উদ্বাস্তুদের ওপর খুব আছে তা তাঁদের কার্য্য কলাপ দেখলেই বোঝা যায়। প্রচার দপ্তর হতে রোজ রোজ গাদা গাদা বিবৃতি আর প্রেস নোট বের করে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা চলেছে—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি বাস্তুহারাদের ভাল করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন; উদ্বাস্তুদের উচিত তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে লক্ষীছেলে হয়ে মরা মানুষের মত পড়ে থাকা। মাসিকে কয়েক কোটী টাকা খরচ করে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়ে গেল তাতে বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে কত মধুর মধুর কথা শোনা গেল। এই সব বক্তৃতা আর প্রেসনোট দেখলে মনে হবে সত্যিই বুঝি বা কংগ্রেসী নেতারা এই সব হতভাগ্যদের জন্য কিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু আদতে ওসবগুলি যে ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়, বড় বড় মিষ্ট কথা বলে জনসাধারণকে বোকা বানাবার মতলবেই যে ঐ রকম করে বলা হয়ে থাকে তা কংগ্রেসী সরকারের বাস্তুহারা নীতি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

দিল্লীর কিংসওয়ে ক্যাম্পে বর্ত্তমানে প্রায় একহাজার বিধবা ও তাঁদের তিন হাজার শিশুসন্তান আছে। সরকার

( ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন )

( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর )

প্রতিরোধ কমিটী সে রকম সংগঠন নয়; একমাত্র আর, এস, পিই তার অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবভাবে বললে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটী আর, এস, পির দলীয় ফ্রন্ট ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যকারের ঐক্যবদ্ধ জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে নতুন সংযুক্ত সংগঠনের দরকার, তাই আর, এস, পিরও উচিত তাঁদের ঐ কমিটী ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত সংগ্রামশীল প্রগতিশীল দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে সংযুক্ত কমিটী গঠনের কাজে এগিয়ে আসা। কোন দলকে অন্য দলের সংগঠনের অধীনে কাজ করতে বলার সোজা মানে হল, মিলিত আন্দোলন না চাওয়া।

কমরেড দেবের প্রতিটী কথায় জন সমর্থন মেলে। তাঁরপর বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক, কালু শেখ, শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা বলেন। সভায় দীপেন চৌধুরী, প্রফুল্লধন মুখার্জী, প্রদ্যুত মিত্র, সুভাষ চৌধুরী প্রভৃতি বক্তা বক্তৃতা করেন।

যখন কমিটী গঠন ও অন্যান্য প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হয় তখন আর. এস. পি, সোস্যালিষ্ট পার্টি ও আর, এস, এস যুক্তভাবে তার বিরোধীতা করতে থাকেন। আর, এস, পি, প্রতিনিধি পরিষ্কারভাবে বলেন যে তাঁরা যুক্ত কমিটী বোঝেন না, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটী ছাড়া অন্য কোন কমিটী তাঁরা চান না এবং তার সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতা করতেও পারেন না। সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহিত হয়। শ্রীপ্রফুল্লধন মুখার্জীকে আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত করে সর্ব্বদলের প্রতিনিধি ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে এক শক্তিশালী সংযুক্ত কমিটী গঠিত হয়।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নীচের দাবীগুলি গৃহিত হয়—১। সমগ্র মালদহ জেলাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে হবে; ২। সমগ্র জেলায় পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং মাথা পিছু সপ্তাহে সাড়ে তিন সের চাল দিতে হবে; ৩। প্রকাশ্য বাজারে টাকায় তিন সের চাল চাই; ৪। জনসাধারণের সহযোগিতায় চোরাকারবারী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য খাদ্য অভিযান কমিটীর হাতে ক্ষমতা দিতে হবে; ৫। মালদহ জেলা হতে অন্য কোথায় খাদ্যশস্য পাঠান চলবে না।

# সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের

## ★ কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে ★

# ★ জনসভা ★

গত ২৫শে নভেম্বর, শনিবার সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে হাওরা পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় "শান্তি আন্দোলন ও জনগনের কর্ত্তব্য" নিয়ে আলোচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন মনি মুখার্জি।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষ, "গণদাবী"র প্রধান সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জি, কলিকাতা জিলা সম্পাদক রথীন সেন, ছাত্রনেতা তাপসদত্ত প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন।

সভায় শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ষ্টকহোম আবেদনই শান্তি আন্দোলনের মূল ভিত্তি। শান্তি আন্দোলন Pacfist illusion নহে, ইহার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে শান্তি আন্দোলনকে যুক্ত করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে যে নিখিল ভারত শান্তি কংগ্রেসের দলীয় সংকীর্ণতা শান্তি আন্দোলনকে প্রকৃত পক্ষে ব্যহত করিয়াছে। তাই উহার পরিবর্ত্তে একটি ব্যাপক শান্তি খোঁচা খাড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে।

# ★ জনতার বিভিন্ন দাবী আদায়ের লড়াই—

( ২য় পৃষ্ঠার পর )

যার কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে সেই সমাজতন্ত্র যখন আমরা আমাদের দেশে কায়েম করতে পারব তখনই কেবল জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে। সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষই কেবলমাত্র প্রকৃত সুখী স্বাধীন ভারতবর্ষ হতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ ধনিকশ্রেণীর গরীবকে ইচ্ছামত নিরঙ্কুশে শোষণ করার স্বাধীনতা।

কিন্তু সমাজতন্ত্র বিপ্লব ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শুধু সরকার পালটে সমাজতন্ত্র আনা যায় না; প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রটার উচ্ছেদ করে তার জায়গায় জনরাষ্ট্র কায়েম করতেই হবে। সুতরাং জনগণের স্বাধীনতা পেতে হলে জনতাকে রাষ্ট্রউচ্ছেদের লড়াই করতেই হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিক চাষী ও মধ্যবিত্তকে একদিন তা করতে হয়েছে, তবেই না জনরাষ্ট্র সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতেও যুদ্ধের মধ্যে সে কাজ সারতে হয়েছে; আর মহাচীনে তো বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রগামী অংশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দীর্ঘ তেইশ বছর বিপ্লবী সশস্ত্র লড়াই চালাবার পর শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত তাদের নিজেদের রাষ্ট্র গড়তে পেরেছে। ভারতবাসীকেও ঐ সব দেশের মত সুখ সমৃদ্ধি শান্তির মধ্যে বাস করতে হলে বর্ত্তমানের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রউচ্ছেদের লড়াই করতে হবে। আপোষের মাধ্যমে স্বাধীনতার নামে যেটা আসে সেটা শোষণেরই এক রূপ; জনগণের স্বাধীনতা আনতে হলে বিপ্লব অপরিহার্য্য।

আর বিপ্লবী চিন্তাধারা, বিপ্লবী প্রস্তুতি ছাড়া বিপ্লব সফল হতে পারে না। এবং সে প্রস্তুতি গোড়ে তুলতে হোলে এক বৈজ্ঞানিক ধারাও অনুসরণ করতে হবে। সে ধারার সন্ধান মিলবে বিপ্লবের ইতিহাস অনুধাবন করলে। বিংশ শতাব্দীতে যে কটা সফল জনগণের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তাদের সর্ব্বপ্রধান তাৎপর্য্য নিহিত আছে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকায়, তার সংগ্রামী কৌশলে। আমাদের সেই শিক্ষা অনুধাবন করা একান্তভাবে আবশ্যক। ধনতান্ত্রিক সমাজে পরস্পর বিরোধী প্রধান শক্তিরূপে পুঁজিপতি ও শ্রমিক এই দুটা শ্রেণীই প্রধানতঃ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু এই দুটা শ্রেণী ছাড়াও আরও কয়েকটা উপশ্রেণী সমাজে দেখা দেয় যেমন, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সহরাঞ্চলে এবং জমিদার জোতদার, মধ্য, গরীব ও ভূমিহীন চাষী গ্রামাঞ্চলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এই সব বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক শ্রেণী সম্পর্ক গোড়ে ওঠে। আর সমাজ বিপ্লবে বিভিন্ন শক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা এই শ্রেণী সম্পর্কের দ্বারাই স্থির হয়।

সমাজবিপ্লবের অগ্রগামী অংশ, সুসংগঠিত জঙ্গী বাহিনী, শ্রমিক শ্রেণীকে এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক শ্রেণীসম্বন্ধ উপলব্ধি করতে হয় এবং বিভিন্ন শক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে শ্রেণী ঐক্য গড়তে কিংবা শ্রেণী সংগ্রাম চালিত করতে হয়। এক কথায় শ্রমিক শ্রেণীকে জানতে হয়, সমাজের প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কে, লড়াই মূলতঃ কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে হবে, শত্রুপক্ষকে কোন্ কোন্ শক্তি সাহায্য করতে পারে, কোন্ কোন্ শক্তিকে লড়াইএর শিবিরে টেনে আনা সম্ভব, প্রধান শত্রুকে কি ভাবে ঘায়েল করা সবচেয়ে সোজা হবে এবং শত্রুর মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলিকে কিভাবে পর্য্যুদস্ত বা শক্তিহীন করতে হবে ইত্যাদি। শত্রুকে একঘরে কর তারপর তাকে আঘাত হান—বিপ্লবের এই কৌশল আয়ত্ত করা এবং শ্রমিক শ্রেণীকে এই কৌশল সম্বন্ধে সচেতন করার দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির, মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলের। দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সমাজবিপ্লবের আশু কার্য্যক্রম স্থিরীকৃত হয়। এই কার্য্যক্রম অনুসারেই শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর সাথে শ্রেণী মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। বিপ্লবের এই গোড়ার কথাটা প্রত্যেকটা সাচ্চা মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলকে প্রতিনিয়তই মনে রাখতে হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গত চারবছর ধরে দেশের বুকে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী শাসন চলতে থাকলেও আজ পর্য্যন্ত দেশের বিভিন্ন শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীমৈত্রী স্থাপিত হয়নি। অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ভূমিহীন, গরীব ও মধ্যচাষী এবং সহরাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণী মৈত্রী গড়ে ওটা তো দূরের কথা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই আজ অনৈক্য ও বিভেদের প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা ভারতবর্ষের সর্ব্বহারা আন্দোলনের এক বিরাট দুর্ব্বলতা এবং এই দুর্ব্বলতাকে গায়ের জোরে অস্বীকার না করে বাস্তব ও আত্মসমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী হল তথাকথিত নামধারী সাম্যবাদী দলগুলি।

দেশীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের দেশের ছোট বড় প্রায় প্রতিটি বামপন্থী দলই এই সত্য বাস্তবভাবে উপলব্ধি করছেন যে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা ছাড়া সত্যিকারের কোন গণআন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই বেশ কিছুদিন হতে বিভিন্ন দলের কর্মীদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা শোনা যাচ্ছে এবং তারই ফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন বিষয় বা আংশিক দাবীর ভিত্তিতে ছোট খাট বহু কমিটিই গড়ে উঠছে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই সব কমিটিগুলিকে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা বলে আখ্যাও দেওয়া হচ্ছে। এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠন করার আন্তরিকতা হয়ত প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠনের মূল নীতি অনুযায়ী অগ্রসর হবার কোন উৎসাহই দেখা যাচ্ছে না। তাই এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে সত্যিকারের কোন ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মোর্চ্চাই গড়েই উঠেনি। অথচ পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে উক্ত মোর্চ্চা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগ্রামী জনতার সম্মিলিত হাতিয়ার, এবং চেটে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী এবং এদের প্রতিভূ কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে প্রস্তুত সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সর্ব্বহারা শ্রেণীর অধিনায়কত্বে মিলিত সমাবেশই হোল গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার মূল লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদের লড়াই স্বভাবতই পরিচালিত হবে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা যেহেতু তারাই সবচেয়ে আপোষ বিরোধী এবং বিপ্লবী। আন্দোলনের স্তরে স্তরে সর্ব্বহারা শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণীমৈত্রী দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দোদুল্যমান পাতিবুর্জ্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আপোষকামী নেতৃত্বকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই সব কাজ গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার পক্ষে অবশ্য করণীয়।

এখন প্রশ্ন হোল কেমন করে এই গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গড়তে হবে। গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভিন্ন শক্তিকে যথাযথভাবে সমাবেশ করার প্রধান দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর। শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা দলকেই এই কাজ করতে হবে। ধনিক শ্রেণী ও সর্ব্বহারা শ্রেণীর মাঝখানে যেমন আরও কয়েকটা উপশ্রেণী আছে, তেমনি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী রাজনৈতিক দল এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ছাড়াও আরও কয়েকটা রাজনৈতিক দল আছে যারা মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করছে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রথা আবার শুধু নির্ব্বাচনী আন্দোলনের জন্যে কয়েকটা দল সৃষ্টি করে, অবশ্য এদের সবাই মূলতঃ ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ।

ধনিক ও সর্ব্বহারা শ্রেণীর দলের মাঝখানে যে দলগুলি আছে তাদের সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমবেশী বিরোধী ভূমিকা আছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সব দলের আন্দোলনই এ কথার প্রমাণ।

( শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন )

## —এক শক্তিশালী সংগঠনের নেতৃত্বে লড়তে হবে ★

# ☆ ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে—

( পূর্বপৃষ্ঠার পর )

এই ভূমিকাই গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার এই সব শক্তির যোগদানের ভিত্তি। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত দাবীগুলি সমাপ্ত করা, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং এর জন্যে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর ভারতীয় কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন আপোসহীন সংগ্রামের কার্য্যক্রমই হবে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার কার্য্যক্রম। এই কার্য্যক্রম **ভারতের আগামী সমাজ বিপ্লবের সর্ব্বনিম্ন কার্য্যক্রম।** সুতরাং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন বামপন্থী দল ও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশী গ্রহণ যোগ্য নীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধতা গোড়ে তোলা সম্ভব এবং বাঁচতে হোলে তা গোড়ে তুলতে হবেও।

গণতান্ত্রিক মোর্চ্চাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দলকে এই কার্য্যক্রম সামনে রেখে এগুতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যেহেতু গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠনের উদ্দেশ্য হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একত্রিত করে দেশব্যাপী আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেই আন্দোলনকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেওয়া সেইহেতু **যে সমস্ত দল বা শক্তি গণতান্ত্রিক মোর্চার মূল সংগ্রামের ক্ষেত্রে—বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী সরকারের অবসানের ও ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধ সংগ্রামে—দোদুল্যমানতা বা সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছে তাদের এ মোর্চায় স্থান হতে পারে না।** ঐক্যবদ্ধতাই লক্ষ্য সংগ্রামহীনতা নয়; তাই সংগ্রাম ছেড়ে আয়তন বাড়াবার দিকে নজর দিলে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

উপরোক্ত কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে অবিরাম সুপরিকল্পিত আন্দোলনের মারফৎই ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা শক্তি সংগ্রহ করতে থাকবে বিভিন্ন দল ও শক্তির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধতা গোড়ে উঠবে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্যে একদিকে যেমন নীচ হতে আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্য গড়তে হবে অন্যদিকে তেমনি আবার এই কাজকে দ্রুততর ও অধিকতর কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে বোঝাপড়া করতে হবে। এর কোন টাকেই বাদ দিয়ে সাত্যকারের সংগ্রামী ও সংগ্রাম চালাবার মত শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গড়া সম্ভব নয়। জনতার মধ্যে সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধতা না আনতে পারলে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা কাগজী মোর্চ্চায় রূপ নেবে এবং ওপরে শক্ত ও স্থায়ী ঐক্যবদ্ধতা দেখা দেবে না। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে আলোচনা বাদ দিয়ে এগুতে গেলে বাস্তবে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা রূপ নেবে কোন একটা বা দুটা বড় বা ছোট দলের দলীয় ফ্রন্ট।

মুখে সব দলই এই নীতি সমর্থন করে অথচ বর্ত্তমানে বাস্তবে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠন করার নামে যা চলছে তার গোড়ার গলদই হোল এই নীতিকে বিসর্জ্জন দেওয়া। গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা বলতে কেউ বুঝছেন—বিভিন্ন বামপন্থীদলগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে শুধু একটা মাত্র বড় সম্মিলিত দল তৈরী করা, কেউবা ভাবছেন - একটা বড় দলের মধ্যে ছোটখাট দলগুলির মিশে যাওয়া। এই ধরণের চিন্তা যেমন অবাস্তব তেমনি অবৈজ্ঞানিক। প্রথমতঃ সব কটা বামপন্থীদলের একটা দলে মিলে যাওয়া বা নিজেদের দল ভেঙ্গে দিয়ে নতুন একটা দল গোড়ে তোলা—এ অবস্থা আজ অচিন্তনীয়, দিবাস্বপ্ন। আর যদি ধরে নেওয়া হয় এরকমটা রাতারাতি ঘটে গেল তাহলেও সুবিধা হবে না। কারণ দলের জন্যেই দল গড়া নয়, দল গড়ার কারণ বিপ্লব সফল করা, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যেই বিভিন্ন দলের সৃষ্টি। এই সব ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ-সম্বলিত দলের মিলনে যে সম্মিলিত দল জন্ম নেবে তাতে বিভিন্ন চিন্তা ও স্বার্থের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হবে, ফলে বিপ্লবীদলের চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতিতে যে স্বাজাত্য ও সম্পূর্ণ একত্ব থাকা অপরিহার্য্য এবং যার অভাব থাকলে কোন দলই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে না, তা মোটেই থাকবে না। এই ধরণের সম্মিলিত দল বিপ্লবী দল না হয়ে বড় জোর পার্লামেন্টারী দল হবে। তাতে জনতার লাভ? গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না বরং ঐ মোর্চ্চার সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বিপ্লবী দলের কার্য্যকারীতার ওপর। **সুতরাং যাঁরা গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের নামে সর্ব্বদল সমন্বয়ের নীতি প্রচার করছেন তাঁরা উপকারের চেয়ে অপকারই করছেন বেশী।**

এই গেল একধরণের বিভ্রান্তি; অন্য আর এক ধরণের বিভ্রান্তি ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এঁরা মনে করেন কয়েকটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় ও দাবীর ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ যুক্ত কমিটি গঠনই গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা গড়া। যেহেতু পূর্ণ কার্য্যক্রমকে বাদ দিয়ে আলাদা আলাদা দাবীর ভিত্তিতে আলাদা আলাদা সংগঠন গড়া হচ্ছে সেই হেতু গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার যে প্রশস্ত চরিত্র থাকে তা এখানে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে; তার ফলে কর্ম্মসূচী ও সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধতা হবার বদলে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন দলের মধ্যে অবাঞ্ছিত মিতালী বা রেষারেষি। গণতান্ত্রিক মোর্চ্চাকে গড়তে এবং তাকে সবল করে তুলতে হলে জনতার সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন মোর্চ্চার নেতৃত্বে সংগঠিত করতে হবে। গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার কর্ম্মসূচীতো জনতার এই গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়া নিয়ে হবে। আর তাই যদি হয় তাহলে খাদ্যের জন্যে একটা কমিটি, ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যে আলাদা কমিটি, প্রভৃতি এই ধরণের বিভিন্ন দাবী নিয়ে লড়ার জন্যে যদি বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয় আলাদা আলাদা ভাবে তাহলে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার কাজ কি দাঁড়ায়? শুধু নামে টিকে থাকা নয় কি? এই ধরণের বিচ্ছিন্ন সংগঠনগুলির পক্ষে দেশব্যাপী প্রবল গণআন্দোলন গোড়ে তোলা অসম্ভব অথচ সেইটাই আজকের লক্ষ্য। **ইউ, এস, ও, আইকে ভারতবর্ষের প্রকৃত জঙ্গী গণতান্ত্রিক মোর্চা হিসেবে রূপ দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাঁরা আজও এর বাইরে থেকে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের নামে আন্দোলনকে বিভক্ত করছেন তাঁদের কাছে আমাদের বক্তব্য ভুল পথে না গিয়ে ইউ, এস, ও, আইকেই গণতান্ত্রিক মোর্চায় রূপ দেওয়া তাঁদের কর্ত্তব্য।**

সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মোর্চ্চার কার্য্যক্রম সফল করতে হলে অবিলম্বে বিভিন্ন মার্কসবাদীদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে; এ দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই তাঁদের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা নিজেদের মধ্যেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। এই দুরপনেয় কলঙ্ক কাটিয়ে গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা সফল করার উদ্দেশ্যে সাম্যবাদীদের মধ্যে ঘন ঐক্যবদ্ধতা গড়বই গড়ব—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে প্রত্যেকটি সাচ্চা সাম্যবাদীর। আমরা তাঁদেরই আহ্বান দিই।

পড়ুন
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের
ইংরাজী মুখপত্র
**Socialist Unity**
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

## গণতান্ত্রিক মোর্চাকে ধ্বংস করবে ★

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

# ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই দুর্ভিক্ষের হাত হতে মুক্তির একমাত্র উপায়

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

ক্ষাতর চিৎকার সহ্য করতে না পেরে সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন লাগিয়ে পুড়ে মরছে। বাংলার জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতিমণ চালের দর হল ৬০৲ টাকা থেকে ৭৫৲ টাকা মুর্শিদাবাদে ৪০৲ থেকে ৪৫৲, নদীয়ায় ৩০৲ থেকে ৫০৲। বিহারে ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পড়েছে; কেবলমাত্র সাড়ে ২৮ লাখ লোকের খাবার মত খাদ্য সেখানে আছে। বাকী ৪ কোটীর মত জন সংখ্যার কি হবে? উত্তর প্রদেশে ১৫ই নভেম্বর হতে সপ্তাহে সাতছটাক রেশন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাদ্রাজে খাদ্যের অভাবে লোকে গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করেছে। তবুও নাকি কংগ্রেসী সরকারের মতে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। কোথায় গেল জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রতিশ্রুতি! তার বদলে গরীব চাষীদের কাছ থেকে টাদা আদায় করা হচ্ছে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য। কোথায় গেল ট্রাকটারের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা! তার বদলে তা দিয়ে অস্ত্র আমদানী করা হচ্ছে। কোথায় গেল জমিতে সার দেওয়ার ব্যবস্থা! আট বছর ধরে কোটী কোটী খরচ করেও সারের কারখানা গড়ে উঠল না। আর কোথায় রইল জলসেচের ব্যবস্থা! দামোদর, মহানদী, কুশী প্রভৃতি পরিকল্পনার কাগজই শুধে নিল চাষীর বুকের রক্ত। কোটী কোটী টাকা খরচ করা হল শুধু মোটা মাইনের বাবু ও সাহেব পোষার জন্য। ধন্য খাদ্যনীতি আর পরিকল্পনার বাহার কংগ্রেসী বাবুদের। জনতা রয়েছে উপোষ করে, মন্ত্রীরা উপদেশ দিচ্ছেন—সপ্তাহে এক দিন উপোষ কর, সোমবার করে চাল বা গম খেও না, দার্জিলিং হতে বেশী করে আলু আনাও ইত্যাদি। সরকারের চোখের ওপর স্বচ্ছন্দে কালবাজারী চলেছে, সরকার নির্বিকার। মন্ত্রীরা এবং তাঁদের অনুগ্রহ-ভাজনরা নিজেরাই চোরাকারবার দাপটে চালাচ্ছেন। ধরে কে? এহেন যে সরকার তাকে জনসাধারণ সমর্থন করবে কেন? নয়াচীন এক বছরে যা করেছে ভারতীয় রাষ্ট্র চার বছরেও তার শতাংশও করে নি। করবে না করতে পারেও না যেহেতু আজকের চীন গণরাষ্ট্র, জনস্বার্থ রক্ষা করাই তার লক্ষ্য আর ভারতীয় রাষ্ট্র হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জনতাকে শোষণ করে জমিদার, কলওয়ালাদের পকেট ভরানই তার উদ্দেশ্য। যতদিন এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থাকবে ততদিন দুর্ভিক্ষ, অনাহার, উপবাস, অপমৃত্যু থাকবে। তা থেকে মুক্তি পেতে হলে—সমস্ত গণতন্ত্রী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদের এবং জনরাষ্ট্র কায়েমের জন্য। একমাত্র এই পথেই আসবে খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান। সোভিয়েট ইউনিয়নে, নয়াচীনে, মধ্যইউরোপে তা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেশেও তা হবে—এই কথা বুঝে এগিয়ে যেতে হবে।

# উদ্বাস্তুদের সাহায্যের বহর

( ৫ম পৃষ্ঠার পর )

বাহাদুর সম্প্রতি এক বিবৃতিতে দেশ-বাসীকে জানিয়েছেন যে, এই ক্যাম্পটির প্রত্যেক বাস্তুহারা একরকম প্রায় রাজার হালে আছেন। সরকারী অভিধানে সুখে সচ্ছন্দে থাকা মনে হল, মাসিক এক টাকা করে ভরণ পোষণের খরচ পাওয়া। পুনর্ব্বসতি বিভাগ হতে কিংসওয়ে ক্যাম্পের জনৈক উদ্বাস্তু মহিলা এই মর্ম্মে একটা চিঠি পেয়েছেন যে, "ভরণ পোষণের ভাতা চেয়ে দিল্লীর চিফ্ কমিশনারের নিকট আপনি যে আবেদন করেছিলেন, সেই সম্পর্কে আপনাকে জানান যাচ্ছে যে, ভারত সরকার আপনাকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য মাসিক একটাকা করে ভরণ পোষণ ব্যয় সন্তুষ্টচিত্তে মঞ্জুর করেছেন। আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আপনি রসিদ সহ আগামী ১১ই মে বেলা ১১টার সময় নয়া দিল্লীর উদ্বাস্তু সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ অফিসের পি ব্লকের ৩৪ নম্বর কামরায় উপস্থিত হয়ে আপনার ভরণ পোষণের টাকা নিয়ে যাবেন। পাসপোর্ট সাইজের (২"×২") তিনখানা ফটোও আপনাকে দাখিল করতে হবে। উহা সঙ্গে আনবেন।"

এই চিঠির পর সন্দেহই থাকতে পারে না মন্ত্রীমণ্ডলী বাস্তুহারাদের জন্য কিরকম ভাবছেন। বিধবা উদ্বাস্তুদের ভরণ পোষণের ব্যয় হিসাবে মঞ্জুর করা হল মাসিক ১৲ টাকা। তাও জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসের টাকা মিলল মে মাসে। আর এই দু টাকা পাবার জন্য বিধবা ভদ্র মহিলাকে ক্যাম্প থেকে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী উদ্বাস্তু সম্পত্তি রক্ষণা বেক্ষণ অফিসে যেতে হবে এবং গাঁট থেকে কমপক্ষে ৪৲ টাকা খরচ করে পাসপোর্ট সাইজের ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা। এক টাকায় যদি একমাসের ভরণ পোষণের ব্যয় হয় তাহলে মন্ত্রী মশাই বা এত করে নিচ্ছেন কেন? আর দুটাকা পাবার জন্য অন্ততঃপক্ষে চার টাকা খরচ করতে হবে —এতো সরকারী নিয়ম। এর সঙ্গে আরও কিছু দক্ষিণা দিতেই হবে, এইরকম দস্তুরই। ধন্য কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী; ধন্য তোমাদের মহানুভবতা।

উপরোক্ত ভদ্রমহিলাই একমাত্র উদাহরণ নন। অসংখ্য বিধবাকে মাসিক একটাকা করেও না দিয়ে আট আনা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে।

দিল্লীর কিংসওয়ে ক্যাম্পের উদ্বাস্তু বোনেদের সমস্যা—মানুষের মত বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা—আর পূর্ব্ববাংলা হতে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির সমস্যা এক ও অভিন্ন। উপরন্তু যে অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর চক্রান্তে তাঁরা আজ গৃহ-হারা সর্ব্বহারা সেই শ্রেণীর রাষ্ট্র—ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র—তাঁদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিবিধান করবে না, করতে পারেও না। শোষণের ভিৎ উপড়ে ফেলে, জনরাষ্ট্র কায়েম করতে পারলেই তবে মানুষের মত বাঁচার অধিকার মিলবে। এ কথা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বাস্তুহারা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী কংগ্রেসী সরকার ও তার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য লড়াই আরম্ভ করেছে। এই সংগ্রামের পরিপূরক অংশ হিসাবে বাস্তুহারা আন্দোলনকে পরিচালিত করুন। সারা ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে তুলুন রামপন্থী নেতৃত্বের অধীনে। তার জয়েই হবে উদ্বাস্তুদের জয়, মানুষের মত বাঁচার দাবী প্রতিষ্ঠা।

## নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে

# কলিকাতায় বিরাট জনসমাবেশ

গত ১১ই নভেম্বর, শনিবার সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, 'গণদাবী'র প্রধান সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জি।

সভায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষ, শ্রমিক নেতা সনৎদত্ত, ছাত্র নেতা সুকোমল দাশ-গুপ্ত, অনিল সেন ও গায়ত্রী দাশগুপ্তা প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেন "ক্ষমতা হস্তান্তর দেশের শোষণের অবসান ঘটাইতে পারেনি বরঞ্চ কংগ্রেসী শোষণ ও শাসন জনতার দুঃখ বাড়িয়েই চলেছে। যতদিন পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তাই শোষণের হাত থেকে চিরতরে রক্ষা পাবার সর্ব্বপ্রথম নমুনা রুশদেশের নভেম্বর বিপ্লব প্রতিটি দেশের মেহনতী জনতা পালন করে; এর সফল পরিনতিতেই নভেম্বর বিপ্লব পালনের সার্থকতা।"

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন "কংগ্রেসী রামরাজত্ব জনসাধারণের নহে ওটা টাটা-বিড়লা ধনিক গোষ্ঠীরই অবাধ শোষণের রাজত্ব। এই রাজত্বের বিনাশ সাধনেই জনগণের মুক্তি।"

সভায় দেশের সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতির উপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

# বংশীধরপুরে কৃষক সমাবেশ

( ৫ম পৃষ্ঠার পর )

তুলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানুষের মত বাচার দাবীতে আন্দোলন করতে হবে, তা যদি আমরা পারি তাহলে সত্যিকারের শোষিত মানুষের দল আমাদের লড়াইয়ে যোগ দেবেই দেবে আর আমরা জিতবই জিতব। আর তা না করে শুধু সভায় বক্তৃতা শুনে চলে যাই, আর বাড়ী গিয়ে ভাবি অমুকে আমাদের হয়ে লড়বে, তাহলে দেখবেন বেশী লোক লড়ছে না আর যারা লড়ছে তারাও জিতবে না। তাই মানুষের মত বাচার চেষ্টায় আজ এই সভা থেকে যাবার পর ১৫ দিনের মধ্যে ৫ হাজার সভ্য করে ফেলুন ক্ষেত মজুর ফেডারেশন আর কিষাণ সভার। সেটাই হল আজকের দিনে সব চেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী কাজ।" কমরেড ব্যানার্জীর বক্তৃতার পর কমরেড সভাপতি তাঁর অভিভাষণ দেন।

সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। প্রস্তাব তিনটি উত্থাপন করেন কমরেড মণিমোহন দে, ইয়াকুব পৈলান ও সমর রায়।

এরপর সভা ভঙ্গ হয় এবং সভাস্থল হতে দুই মাইল দীর্ঘ এক মিছিল সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী ও সরকার-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিকসন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্ম-তলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত